২০২২ Q. চীন জাপান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। তুমি কি মনে কর এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাপানি সামরাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাপানে দ্রুতগতিতে উন্নতি ঘটতে আরম্ভ করেছিল। মেইজি শাসকেরা জাপানকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আধুনিকীকরণের মূল কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথ রুদ্ধ করা। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ যাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের মতো জাপানেও তাদের প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তাই জাপান নিজেকে অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভর করার জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। শোগুন শাসনকালে পাশ্চাত্য দেশগুলি স্ব-স্ব স্বার্থে জাপানের সঙ্গে কতকগুলি বৈষম্য-মূলক চুক্তি সম্পাদিত করে। মেজি সরকার সেই সব চুক্তি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইয়াকুরা টোমোমি-র (Iwakura Tomomi 1825-80) নেতৃত্বে একটি মিশন প্রেরণ করেন। কিডো, ওকুবো ও ইটো সমেত এই মিশনের সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৮। সহযাত্রী হন ৫৪ জন ছাত্র, যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমে থাকাকালীন পাশ্চাত্য আন আহরণ করা। মিশনটি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরে যাত্র ক'রে প্রথমে উপস্থিত হয় আমেরিকায় এবং পরে ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং শেষে বিফল মনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর। বৈষম্য-মূলক চুক্তিগুলি ছিল জাপানের নিকট হীনতার প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ চুক্তিগুলি পরিবর্তন করতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, জাপানের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। জাপানি মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা হল জাপানের আশু পাশ্চাত্য দেশগুলির মত শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্টা লাভ করতে হবে। অন্যথায় জাপানের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাই মেজি সরকারের সিদ্ধান্ত হয় এক বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা। এই নীতি অনুসরণে জাপান ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চীন-অধিকৃত ফরমোজা দ্বীপ আক্রমণ করে, যার ফলে লুচু দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারে আসে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বনিন দ্বীপপুঞ্জ জাপান অধিকার করে। সমকালে জাপান কোরিয়ার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী ।। ফলে শুরু হয় চীন-জাপান যুদ্ধ।

দ্বিতীয়ত জাপানের জনসংখ্যা ছিল ক্রমবংমান। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের অজনসংখ্যার সর্বপ্রথম মোটামুটি হিসাব (estimate) করা হয়। তখন জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩ মিলিয়ন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সর্বপ্রথম সেনসাস্ গৃহীত হয়। তখন দেশের জনসংখ্যা দিদ্ধ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৬ মিলিয়ন। অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৩ মিলিয়ন। দেখা যাচ্ছে, গড়ে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১/২ মিলিয়ন। এই অনুপাতে ১৮৭২ থেকে মেজি যুগের শেষ বৎসর ১৯১২ পর্যন্ত-৪০ বৎসরে জনসংখ্যা অন্তত ২০ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে মোট দাঁড়িয়ে থাকবে ৫২.৫৩ মিলিয়ন। মেজি যুগে জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা অধিকতর ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে কারে হল জন্মহার ছিল এক হাজারে মাত্র ১৭ কিন্তু ১৯২০ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মহার দাঁড়ায় এক পিচয়ে হাজারে যথাক্রমে ৩৬.২ এবং ৩২.৩৫। মেজি যুগে স্বাস্থ্যরক্ষার উন্নতমানের ব্যবস্থা এবং আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। যে যুগে জাপানের জনসংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান সেই যুগে মাত্র ১৫ শতাংশ জমি আবাদের উপযুক্ত ছিল। ফলে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রয়োজনমত শস্যোৎপাদন সম্ভব ছিল না। সে ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে খাদ্য আমাদানী ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। কোরিয়াতে জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল। জাপান তখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ ছিল না। অথচ তখন কোরিয়াতে কোরিয়ার অধিবাসীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য (বিশেষত জাপানিদের প্রধান খাদ্য চাউল) উৎপন্ন হত। কোরিয়াকে কুক্ষিগত করতে না পারলে সেখানে থেকে খাদ্য আমদানি করা জাপানের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না। এতদ্ব্যতীত, কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানের আমদানি অন্যুন ৪০ শতাংশ আসত কোরিয়া থেকে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও জাপানের প্রয়োজন ছিল কোরিয়ার উপর ক্ষমতা বিস্তার করা। কিন্তু চীন বিনা যুদ্ধে জাপানের এই ক্ষমতা-বিস্তার সমর্থন করবে না জেনে জাপান যুদ্ধনীতি গ্রহণ করে।

চীন-জাপান বিরোধের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হ্যারল্ড ভিনাক (Harold Vinacke) বলেছেন, চীন ও জাপানের ঐতিহাসিক সম্পর্ক কোরিয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এবং আধুনিক ইতিহাসে তাদের মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ কোরিয়াকে নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল (The historical relations of Japan and China all centred in Korea, and it was in and over Korea that they first came into serious conflict in the modem period of their history.)

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কোরিয়ার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালানোর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবার পর জাপান কোরিয়ার সঙ্গে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ চুক্তির মাধ্যমে কোরিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। জাপান ও কোরিয়ার মধ্যে একটি নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইঞ্চন, পুসান, ওনসান-কোরিয়ার এই তিনটি বন্দর জাপানের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। কোরিয়া এতদিন চীনের করদ রাজ্য (Tributary State) ছিল। জাপান যে মুহূর্তে কোরিয়াকে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেয়, সে মুহূর্তেই স্বাভাবিকভাবেই চীনের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কোরিয়াতে জাপানের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য চীন সচেষ্ট হয়। ফলে চীন-জাপান দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে দুটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। একটি ছিল জাপানের সমর্থক, অপর গোষ্ঠী ছিল চীনের সমর্থক। জাপান সমর্থক গোষ্ঠী ছিল প্রগতিবাদী ও কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু চীনপন্থী গোষ্ঠী ছিল প্রগতি-বিরোধী এবং যাবতীয় আধুনিক সংস্কারের বিপক্ষে। এই দুই বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব চীন জাপান দ্বন্দ্ব কে আরো প্রখর করে।

এরপর কোরিয়াতে টংহ্যাক অভ্যুত্থান দেখা দেয়। চীন টংহ্যাক বিদ্রোহ দমন করার জন্য একটি ছোটো বাহিনী কোরিয়াতে পাঠিয়ে দেয়। জাপান তৎক্ষণাৎ প্রায় ৮০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী কোরিয়াতে পাঠায়। টংহ্যাক বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। কিন্তু জাপান তখনও কোরিয়া থেকে সেনা প্রত্যাহার করে না। ২৫ জুলাই জাপানিরা কোরীয় উপসাগরে "কাওশিং" নামে একটি চীনা জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিগত কুড়ি বছর ধরে জাপানি রাষ্ট্রনায়করা জাপানকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত জাপানের বাহিনী চীনা সেনাদের অনায়াসে পরাস্ত করে। যুদ্ধে পরাজিত চীন জাপানের সঙ্গে শিমোনোসেকি (Shimonoseki) সন্ধি স্বাক্ষরিত করে (১৮৯৫, ১৭ই এপ্রিল)।

জাপানের অভাবনীয় সাফল্যে পাশ্চাত্য দেশগুলি জাপানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ আতঙ্কিত হয়। এই আতঙ্ক Yellow Peril বা পীতাতঙ্ক নামে অভিহিত। চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয় চীনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীনের দুর্বলতার সুযোগে চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। চীনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, জাপানের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশের হাতে পরাজয়ের ফলে দেশের জনসমক্ষে মাঞ্চু রাজবংশের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হয়। অন্যদিকে চীনের মতো একটি সুবিশাল দেশকে পরাস্ত করার পর জাপানের আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাপান যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল, একদিকে তার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের সাফল্য।

———-